Vol. 35 | No. 1 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা

Volume	35
Issue	1
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	October 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v35i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i1.2
Pages	16-32
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

চল্লিশের দশক বাংলাদেশ ও উপমহাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। একদিকে ১৯৪৫ পর্যন্ত চলেছে বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অন্যদিকে উপমহাদেশে ও বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষ থেকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলতে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এ. কে. ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত কৃষকপ্রজা পার্টি মুসলিম আসনে মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪৩টি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ পায় ৩৮টি আসন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতা শরৎ বসু ফজলুল হকের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃবর্গ এতে অসম্মত হয়। এই সুযোগে জিন্নাহ্‌র নির্দেশে মুসলিম লীগ ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করে। ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের কৃষকের স্বার্থে 'বঙ্গীয় চাষী ঘাতক আইন', 'মহাজনী আইন', 'বঙ্গীয় প্রজাত্ব আইন' পাশ করে এবং 'ঋণ সালিশী বোর্ড' গঠন করে। এই সঙ্গে শ্রমিক মঙ্গল 'আইন' ও 'মাতৃমঙ্গল আইন'-ও পাশ হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ফলে এবং শিক্ষিত মুসলমান তরুণদের চাকরির ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত দৃঢ়তর ভিত্তি লাভ করে। তবে কৃষক প্রজা পার্টিতে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় এবং কার্যত ফজলুল হক মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভার প্রধানে পরিণত হন এবং জিন্নাহ্ মুসলিম লীগের কার্যক্রমে ফজলুল হককে সক্রিয় করে তোলেন। ফলে মুসলিম লীগ 'বাঙালী মুসলমানের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।' এই পটভূমিতে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯৪০-এর মুসলিম লীগের অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। ১৯৪১ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবই 'মুসলিম লীগের আদর্শ' রূপে ঘোষণা করা হয়। লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক ফজলুল হকের সঙ্গে এর পর জিন্নাহ্‌র মতবিরোধ দেখা

দেয় এবং জিন্নাহ্ ফজলুল হককে ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে মুসলিম লীগ থেকে 'বহিষ্কার' করেন। ফজলুল হক তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় 'শ্যামা–হক মন্ত্রিসভা' গঠন করেন (১২ ডিসেম্বর ৪১)।

১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থা থেকে গোপনে দেশত্যাগ করেন (২৬ জানুয়ারি)। তিনি প্রথমে কাবুল হয়ে জার্মানি যান; সেখান থেকে সাবমেরিনে করে জাপান পৌছান। তিনি জাপানের সহায়তায়, জাপানের হাতে বন্দি ১৪০০ ভারতীয় অফিসার ও পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিঙ্গাপুরে গঠন করেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ।' ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপান দক্ষিণপূর্ব এশিয়া দখল করে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। ব্রিটিশ মন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যুদ্ধশেষে, শর্তসাপেক্ষে, ভারতবর্ষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া হবে— এই প্রস্তাব নিয়ে দিল্লি আসেন (মার্চ ১৯৪২)। ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয় এবং গান্ধীর নির্দেশে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (৫ আগস্ট) বৃটিশের বিরুদ্ধে 'কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট' শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। সুভাষ বসু সিঙ্গাপুরে 'আজাদ হিন্দ সরকার' গঠন করেন। (অক্টোবর ১৯৪২) অক্ষশক্তিভুক্ত ও তার অধীন দেশসমূহ এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং এই সরকার 'আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জের কর্তৃত্ব লাভ করে'। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আরাকান সীমান্ত পথে আজাদ হিন্দ ফৌজ চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করে; ফৌজের অপর একটি দল বর্মা ও আসামের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে মনিপুরের কিছু অংশ দখল করে।

১৯৪৩ সালে গভর্নর স্যার জজ হার্বার্ট ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে বলেন (২৭ মার্চ)। তাঁর পদত্যাগের পর, ২৪ এপ্রিল, খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হয়। ১৯৪১ সালের পর থেকেই হোসেন শহীদ সোহ্‌রওয়ার্দী বাংলার মুসলিম লীগের প্রধান নেতায় পরিণত হন। ১৯৪৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন আবুল হাশিম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং অবাঙালি হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীদের মজুতকারী ও চোরাকারবারীর পরিণামে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। 'পঞ্চাশের মন্বন্তরে' (১৩৫০/ ১৯৪৩) প্রায় ২০ লক্ষ বাঙালি অনাহারে প্রাণ হারায়। নাজিমুদ্দীনের খাদ্যমন্ত্রী সোহ্‌রওয়ার্দীর পক্ষে, সম্পূর্ণ প্রতিকূলতার মধ্যে, কিছুই করা সম্ভব হয় না।

১৯৪৪ সালে আবুল হাশিম ঢাকায় শাসসুল হকের নেতৃত্বে 'মুসলিম লীগ

কর্মী শিবির' গঠন করেন। এর ফলে সংগঠনে 'ঢাকার নবাব পরিবারের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যায়' এবং পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ 'মুসলমান জন সাধারণের গণ সংগঠনে পরিণত হয়'।[১] ১৯৪৫ সালে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান ইসু-র ভিত্তিতে' নির্বাচন করে এবং বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মনোনীত সকল প্রার্থীই জয় লাভ করে। এটি ছিল সোহ্‌রওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের সাংগঠনিক শক্তির বিজয়। সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হয় সোহ্‌রওয়ার্দীর নেতৃত্বে। বৃটিশ ভারতবর্ষে সোহ্‌রওয়ার্দীই ছিলেন বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম লীগ দলের নেতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের নির্বাচনে যুদ্ধজয়ী চার্চিল ও তাঁর রক্ষণশীল দল পরাজিত হয়। বিজয়ী শ্রমিক দলের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলি ভারতের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠান। আলোচনার আগে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় আইন সভার পাঁচ শতাধিক মুসলিম লীগ সদস্যদের কনভেনশন (১৯৪৬, ৯ এপ্রিল)। জিন্নাহ্‌র নির্দেশে এই কনভেনশনে সোহ্‌রওয়ার্দী উথাপিত 'পাকিস্তান প্রস্তাবে' মূল 'লাহোর প্রস্তাবের' States-এর s বাদ দিয়ে state করা হয় এবং একটি মাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাব উথাপিত হয়। জনাব আবুল হাশিম এই সংশোধনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। জিন্নাহ্ ভবিষ্যৎ গণপরিষদে সিদ্ধান্ত হবে ইত্যাদি বলে মিথ্যা আশ্বাস দেন।[২]

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাবিনেট মিশন ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিকল্প হিসেবে "ভারতকে তিনটি আত্মনিয়ন্ত্রিত গ্রুপে ভাগ করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখার এবং প্রদেশগুলোর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাসহ একটি পরিকল্পনা পেশ করেন; এই প্রস্তাবে 'খ' গ্রুপে সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তান এবং 'গ' গ্রুপে বাংলা ও আসামের অন্তর্ভুক্তির কথা ছিল"।[৩] শর্তসাপেক্ষে মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণ করে (৬ জুন ১৯৪৬)। গান্ধী প্রথমে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেও আসামের বিরোধিতার জন্য মত পরিবর্তন করেন, পরিণামে কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে (১৯৪৬, ১৯ জুলাই) পাকিস্তান দাবির সমর্থনে ১৬ই আগস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' দিবস ঘোষিত হয়। ঐ 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন বিদসে' চরমপন্থীদের প্ররোচনায় কলকাতায় ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়। তখন বাংলার জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ মুসলমান হলেও কলকাতার জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ ছিল মুসলমান এবং তার মধ্যে একটা প্রধান অংশ ছিল অবাঙালি

মুসলমান। দাঙ্গায় মুসলমানরাই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দাঙ্গা নিরসনে সোহ্‌রওয়ার্দী অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। মুসলিম লীগ প্রথমে এই সরকারে যোগ দিতে সম্মত ছিল না তবে পরে যোগ দেয়। এদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব নিয়ে ভারতে শেষ বৃটিশ ভাইসরয় হয়ে আসেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ভারতবর্ষে তখন বাংলা ছাড়া আর কোনো প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ছিল না। "সুতরাং বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা না থাকলে জিন্নাহ্‌ কংগ্রেসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না এবং কংগ্রেসও ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান মেনে নিতে বাধ্য হত না।"[৪] লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনায় পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত হলে কংগ্রেস পাকিস্তান মেনে নেবে এই দাবি উত্থাপিত হয় এবং মুসলিম লীগ তা মেনে নেয়। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ঐ শর্তানুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বৃটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এই সময় পাঞ্জাবে মুসলমান, হিন্দু ও শিখেরা ভয়াবহতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হয়। নজিরবিহীন ঐ বর্বরতার ফলে "পশ্চিম পাঞ্জাব সম্পূর্ণ হিন্দু শিখমুক্ত এবং পূর্ব পাঞ্জাব সম্পূর্ণরূপে মুসলমান মুক্ত হয়ে যায়।"[৫] বাংলায় তখন (১৯৪৭, ফেব্রুয়ারি) সোহরওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু ও কিরণশঙ্কর রায় 'স্বাধীন ও বৃহত্তর বাংলা'র পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এই পরিকল্পনা জিন্নাহ্‌ ও গান্ধী প্রথমে সমর্থন করেন এবং "২০ মে শরৎ বসুর বাড়িতে কংগ্রেস লীগ যুক্ত কমিটির সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চুক্তিপত্রেও স্বাক্ষর দান করেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দের বিরোধিতার ফলে গান্ধীজী তাঁর মত পরিবর্তন করেন।" এরপর "বঙ্গীয় আইন সভায় উভয় পরিষদের যৌথ অধিবেশনে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সভ্যরা বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। কিন্তু পশ্চিবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সদস্যরা বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।"[৬]

বৃহত্তর ও স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনার জন্য পরবর্তীকালে বারংবার সোহ্‌রওয়ার্দীকে পাকিস্তানের 'দুশমন'-রূপে অভিযুক্ত করা হয়। এই অযুহাতেই, জিন্নাহ্‌ ও লিয়াকত আলীর চক্রান্তে, বাংলার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহ্‌রওয়ার্দীর বদলে পাকিস্তানের পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন খাজা নাজিমুদ্দীন (১৯৪৭, ৫ আগস্ট)। পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন, ব্রিটিশ ভারতে বাংলা ছাড়া মুসলিম লীগের কোথাও কোন মন্ত্রিসভা ছিল না এবং বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উত্থাপন করেন 'লাহোর

প্রস্তাব' আর ব্রিটিশ বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রওয়ার্দী উত্থাপন করেন 'পাকিস্তান প্রস্তাব।' বাঙালি মুসলমান এবং বাংলায় প্রথমে ফজলুল হক ও পরে সোহ্‌রওয়র্দীর নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ছাড়া জিন্নাহ্‌র পক্ষে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভবপর হত না। কিন্তু মুসলিম লীগের উচ্চবিত্ত নেতৃত্বের দক্ষিণপন্থী ধারা জিন্নাহ্‌র চতুর স্বৈরাচারী চক্রান্তের মাধ্যমে প্রথমে ফজলুল হক ও পরে সোহ্‌রওয়ার্দীকে সরিয়ে দেয় এবং প্রতিষ্ঠার আগেই, ভবিষ্যৎ পাকিস্তানে গণতন্ত্রের কবর রচনা করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ববাংলা প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন এবং মুসলিম লীগ বাংলার মুসলমানদের গণ সংগঠনের বদলে কতিপয় চক্রান্তকারীর পকেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল।

২

প্রধানত হিটলার-স্ট্যালিনের অনাক্রমণ চুক্তির কারণে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করে এবং এর বিরুদ্ধে 'না এক পাই, না এক ভাই' মনোভাব নিয়ে অগ্রসর" হয়।[৭] ফলে ইতিপূর্বেই নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বৃটিশ সরকারের কঠোর দমননীতি নেমে আসে। "অসংখ্য নেতাকর্মীকে বন্দী বা কলকাতা থেকে বহিষ্কার করা হয়"। কিন্তু ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে "মুহূর্তের মধ্যে বদল হয়ে গেল যুদ্ধের চরিত্র। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও অতি দ্রুত অনুভব করল নতুন পরিস্থিতি।"[৮] এই 'নীতি পরিবর্তনের ফলে' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ''জনযুদ্ধ" বলে অভিহিত করা হল।[৯] আট বৎসর পর বৃটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে বিষেধাজ্ঞা তুলে নিল এবং বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হলেন ভবানী সেন। পার্টির বেআইনী যুগে প্রধানত সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মার্কসবাদীরা বহু 'অমার্কসবাদী অথচ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ খ্যাতিমান লেখক শিল্পী'দের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। এই সংযোগ বিশেষভাবে ঘটে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ (লক্ষ্ণৌ, ১৯৩৬, ১০ এপ্রিল; সভাপতি, মুনশী প্রেমচাঁদ, সম্পাদক: সাজ্জাদ জহীর), বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ (কলকাতা, ১১ জুলাই ১৯৩৬, সভাপতি: নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সম্পাদক: সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী) এবং বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের ঢাকা শাখার মাধ্যমে। *প্রগতি* সংকলনেও (১৯৩৭, সম্পাদক: সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) তাই দেখা যায় মার্কসবাদী ও গণতন্ত্রকামী অমার্কসবাদী লেখদের সহ-অবস্থান।[১০] উল্লেখ

করা প্রয়োজন যে, বেআইনী থাকাকালে কমিউনিস্ট পার্টি প্রধানত জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যম কাজ করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় দাশের বিবরণ উল্লেখযোগ্য:

> ১৯৩৮ সালে হরিপুরা অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলে বাংলাদেশের কংগ্রেসী মহলে কমিউনিস্টরা আরও তৎপর হয়ে ওঠেন। কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জি, পাঁচু গোপাল ভাদুড়ী ও সোমনাথ লাহিড়ী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরূপে কংগ্রেসকে বামমুখী করার কাজে সে-সময় যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। আর, বিশ্বনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশন হয়ে ওঠে বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী প্রচারের প্রধান প্রবক্তা।[১১]

১৯৩৭–৩৯ সালের মধ্যে 'কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক আন্দোলনে' যুক্ত হন বিনয় ঘোষ, সমর সেন, গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ আরো অনেকে। ১৯৩৮ (ডিসেম্বর)-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে যোগ দেন 'মার্কসবাদী–অমার্কসবাদী অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিক'। সম্মেলন পরিচালনায় সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন মুলকরাজ আনন্দ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও পণ্ডিত সুদর্শন। সম্মেলনে অভ্যর্থনা ভাষণ পাঠ করেন ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এই সম্মেলনের পরই (জানুয়ারি ১৯৩৯) প্রকাশিত হয় "বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম সাংস্কৃতিক (মাসিক) পত্রিকা" *অগ্রণী*।

অগ্রণীর পৃষ্টায় প্রথম কডওয়েল ('ইলুশন অ্যাণ্ড রিয়েলিটি' ও 'স্টাডিজ ইন ডাইং কালচার') ও র‍্যালফ ফক্স-অনুপ্রাণিত বিনয় ঘোষ তীব্র সমালোচনা করলেন বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কবিতার; রবীন্দ্রনাথকে তিনি চিহ্নিত করলেন 'আন্তর্জাতিক কল্পনাবিলাসী, সৌখিন সাহিত্যের স্রষ্টা' রূপে। বাংলা ভাষায় মার্কসবাদী-অমার্কসবাদী মতাদর্শগত সাহিত্যবির্তক সূত্রপাত হল।

অগ্রণী বন্ধ হয়ে গেলে ঢাকায় *ক্রান্তি* (১৯৪০) সাহিত্য সংকলন ও কলকাতায় *অরণি* (১৯৪১) সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ করে (১৯৪২) *জনযুদ্ধ (পিপল্‌সওয়ার)* সাপ্তাহিক পত্রিকা। কংগ্রেস 'কুইট ইন্ডিয়া' প্রস্তাব তুলে (১৯৪২, ৫ আগষ্ট) ইংরেজের বিরুদ্ধে আগষ্ট আন্দোলন শুরু করলে ইংরেজের দমননীতির শিকার হয় কংগ্রেস। অথচ তখন পার্টির নিষিদ্ধ কালের মিত্র কংগ্রেসের বিপরীত অবস্থানে কমিউনিস্টরা। ফলে 'কমিউনিস্ট বিরোধী জেহাদ ও কুৎসার প্লাবনে'

আবহাওয়া বিষিয়ে ওঠে।

এর আগে, ৮ মার্চ ১৯৪২, ঢাকায় ফ্যাসীবাদ বিরোধী মিছিল পরিচালনা-কালে ফ্যাসীবাদী গুন্ডাদের হাতে নিহত হন কমিউনিস্ট লেখক ও তরুণ সংগঠক সোমেন চন্দ। বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী-সহ সকল সচেতন লেখক—শিল্পী এই নৃসংশ ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি প্রদান করেন। ২৮ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ফ্যাসী বিরোধী লেখক সম্মেলন (সভাপতি: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়)। এই সম্মেলনে গঠিত হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'; সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যুগ্ম-সম্পাদক বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিমলচন্দ্র সিংহ, সজনীকান্ত দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, প্রতিভা বসু প্রমুখ। ক্রমে যুক্ত হন অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায়, গোলাম কুদ্দুস, বিজন ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নরহরি কবিরাজ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবি সাহিত্যিক্য ও সাংস্কৃতিক। এই সংঘ বস্তুত এক 'ব্যাপক ভিত্তিক গণফ্রন্ট' গড়ে তোলে। পরিণামে কংগ্রেসের আগষ্ট আন্দোলন' কালের 'কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ' প্রচারের প্রয়াস 'প্রতিহত করে' ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ 'মানুষের মনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আশার আলো'।[১২]

উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৩-এর মে মাসে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে 'সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট' গঠনের 'কোন আলোচনা'ই করেনি। ফলে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বাংলার কমিউনিস্টবৃন্দ তাঁদের সৃষ্টিশীলতার উজ্জ্বলতম বিকাশ ঘটান। এই অর্থে চল্লিশের দশক বাংলা মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের (কবিতা, গান ও নাটক) উৎকৃষ্টতম অবদানের কাল। এই কারণে চল্লিশের মার্কসবাদী ও মার্কসবাদ–অনুপ্রাণিত কবিবৃন্দ তিরিশের প্রতিধ্বনি মাত্র নন। বরং তিরিশের কবিদের মতো তাঁরা নন অধীতজ্ঞানের চন্দ্রালোকে উন্মাতাল। বলা বাহুল্য, তাঁদের সাফল্য এক মাপের নয়। এই চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৯) প্রথম কাব্য গ্রন্থ *পদাতিক* (১৩৪৬)-এ সুস্পষ্ট কাল সচেতনতায় উচ্চারণ করেছেন:

> প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
> ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
> চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
> কাটফাটা রোদ সেঁকে চামড়া। (মে-দিনের কবিতা)।

এ কাব্যের কবি সমকালদর্শী, বাস্তববাদী কমিউনিস্ট; একই সঙ্গে কর্মী ও কবি। বুদ্ধদেব বসু লক্ষ করেছিলেন,

> তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমন কি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা তিনি লিখলেন না; কোন অস্পষ্ট মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও প্রথম কবিতাগুলিতেও লক্ষণীয় ছিলো।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *অগ্নিকোণ* (১৩৫৫)-এ ভালবাসার স্পষ্টভাষা ও পরিপ্রেক্ষিত:

> অন্ধকারে হাতে হাতে তাই গুঁজে দিই আমি
> নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার,
> জরাজীর্ণ ইমারতের ভিৎ ধ্বসিয়ে দিতে
> ডাক দিই
> যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেহ পায়
> আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা
> দুটি হৃদয়ের সেতুপথে
> পারাপার করতে পারে। (মিছিলের মুখ)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দে অধিকার সহজাত। সেই তীব্র ছন্দ-সচেতনতার সঙ্গে গদ্যবাকভঙ্গি মিলিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন এক নিজস্ব কবিভাষা। সমষ্টিগত চৈতন্য কিংবা একক চরিত্র নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে চরিত্রমন সমষ্টি চেতনার উন্মেষ— উভয় প্রকাশে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজেকে বিশিষ্ট করেছেন। তাঁর *ফুলফুটুক* (১৯৫৭), *যত দূরেই যাই* (১৯৬২) *ছেলে ছেলে গেছে বনে* পর্যন্ত প্রতি কাব্যে উত্তরণের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। তাঁর সম্পর্কে মনীন্দ্র রায় লিখেছেন :

> একালের বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনি বোধ হয় গোটা বাংলাদেশের গ্রামজীবনের সঙ্গে বেশি পরিচিত। অথচ কবিতার বাঁধুনিতে এবং কাব্যরুচির পরিচ্ছন্নতায় তিনি পুরোপুরি নাগরিক।—তাঁর কবিতায় গ্রামীণ ইমেজ এসেছে কিন্তু গ্রাম্য আবেগ প্রশ্রয় পায় নি।[১৩]

৪

চল্লিশের দশকের অবিস্মরণীয় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৩৩৩-১৩৫৪; ১৯২৬-১৯৪৭) যক্ষায়, একুশ বৎসর বয়সে অকালমৃত্যু বরণের আগে মাত্র ছ-সাত বৎসর কবিতা লিখেছেন। বিষয় ও প্রকরণে অসামান্য অধিকার ছিল তাঁর। কমিউনিস্ট কবি ও কর্মী হিসেবে তাঁর চেতনায় কোন অস্পষ্টতা ছিল না। নজরুলের পর ঋজু বক্তব্যের প্রত্যক্ষ উচ্চারণের এত সফল কবিতা আর কোন কবির রচনায় মেলে না। মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে তাঁর কবিতা : *ছাড়পত্র* (১৩৫৪, ১৯৪৭), *পূর্বাভাস, ঘুম নেই* (১৩৫৭, ১৯৫০) *মিঠেকড়া* (১৩৫৮,১৯৫১); কাব্যনাট্য : *অভিযান* (১৩৬০)।

সুকান্তের কবিতার প্রত্যয় তাঁকে সমকালের ও আগামীকালের যথার্থ 'জনতার কবি' রূপে চিহ্নিত করে। তাঁর কালোত্তীর্ণ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি স্মরণ করা যেতে পারে :

১ এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। (ছাড়পত্র, *(ছাড়পত্র,)।*

২ এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম! (অনুভব ১৯৪০, *ছাড়পত্র)।*

৩ বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি তাই তারি দিন-পঞ্জিক লিখে, (অনুভব ১৯৪৬, *ছাড়পত্র)।*

৪ লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম
অনেক দিয়েছি; উজাড় গ্রাম।
সুদ ও আসলে আজকে তাই
যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য চাই। (বোধন, ছাড়পত্র)।

৫ রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;
শপথের চিঠি নিয়ে চল আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে— (রানার, *ছাড়পত্র)।*

৬ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময়
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি।। (হে মহাজীবন, *ছাড়পত্র)।*

৭ জানি রক্তের পিছনে ডাক সুখের বান। (বিদ্রোহের গান, ঘুমনেই)।

৮ সাবাস, বাংলা দেশ, এ পৃথিবী

অবাক তাকিয়ে রয়
জলে পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়। (দুর্মর, *পূর্বাভাস*)।

এই পর্যায়ে অরুণ মিত্র (জন্ম ১৯০৯), মনীন্দ্র রায় (জন্ম ১৯১৯), মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯২০), সিদ্ধেশ্বর সেন (জন্ম ১৯২৪), নরেশ গুহ (জন্ম ১৯২৪) ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জন্ম ১৯২৪)-র কবিতা প্রত্যয় ও সিদ্ধির দ্বন্দ্বে নানামাত্রিক চেতনালোক উন্মোচন করেছে।

৫

চল্লিশের দশকে একদিকে মার্কসবাদী চিন্তা প্রলবলতার অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্ব-সচেতনতার পরিবেশে আর একদল তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে তখনি বিশিষ্টতা অর্জন করেন আহসন হাবীব (১৯১৭–১৯৮৫), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১১৭–১৯৭৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮– ১৯৭৪), তালিম হোসেন (১৯১৮), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২) ও আবুল হোসেন (১৯২২)।

আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* (১৯৪৭) তিরিশের নৈরাশ্য থেকে চল্লিশের আশাবাদী চৈতন্যে উত্তরণের স্বাক্ষরবাহী। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো কবি চারটি পর্যায়ে সাজিয়েছেন এবং পর্যায়গুলোর নাম দিয়েছেন 'প্রহর', 'প্রান্তিক,' 'প্রতিভাস' ও 'পদক্ষেপ'। 'প্রহর' পর্যায়ে কবি দেখেছেন :

১　দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখির মত
বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণমান। ("দিনগুলি মোর', *রাত্রিশেষ*)।

২　তবু উচ্চারিত হয়েছে সম্ভাবনার উপলব্ধি :
ক্ষুধার অনল চির লেলিহান জ্বলে অশান্ত বায়
সংগ্রাম জাগে মানুষের পায় পায়। ('দিনের সুর', *রাত্রিশেষ*)।

'প্রান্তিক' পর্যায়ে ঐতিহ্য ও ইতিহাস সচেতনতার সূত্রে এসেছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ("বাইশে শ্রাবণ") ও কায়কোবাদের জন্ম বার্ষিকী ("অস্ত পারের আকাশকে") প্রসঙ্গ। 'প্রতিভাস' পর্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরে ফলে গ্রাম উজাড় হয়ে যাবার চিত্র ফুটে উঠেছে :

অনেক মানুষ ছিলো মরেছে অনেক

[সেই সাথে মরে গেছে তারো চেয়ে বেশি—
শতাব্দীর গড়ে ওঠা এইসব গ্রাম। (একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ', *রাত্রিশেষ*)।

'পদক্ষেপ' পর্যায়ে সমকালীন বাস্তবতার বিরুদ্ধে সোচ্চার কবি আশাবাদী হয়ে উঠেছেন 'সংঘবদ্ধ জীবনের' 'মুক্তপ্রাণ কঠিন সংগ্রামের' সম্ভাবনায় ("মৃত্যু")। বলেছেন,

নদীর জলে ঝলকে উঠবে মুক্তি,
বন্যা আসবে রেড রোডের প্রান্তে
কেননা
এদিকে আবার জাগবে নতুন সূর্য (রেড রোডে, *রাত্রিশেষ*)।

"এই মন আর এ মৃত্তিকায় বিচ্ছেদ নাই কভু"— এ কথা মেনেই কবি "ঝরাপালকের ভস্মস্তূপে" "নীড়" বাঁধার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ ভাবেই আহসান হাবীব ইংরেজের পরাধীনতার রাত্রিশেষ স্বাধীনত'য় এগিয়ে যান।

সিকান্দার আবু জাফরের চল্লিশের দশকের চেতনায়ও সমধর্মিতা আছে। ১৯৪০–৪৭ পর্বে রচিত কবিতাগুলো কবি সংকলন করেছেন ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্য *প্রসন্ন প্রহর* গ্রন্থে। চল্লিশ দশকের শুরুতে কবি লক্ষ করেছেন "সত্যের খুনে নিষিক্ত ধরাতল।" ("ফাল্গুন হত গান", ''প্রসন্ন প্রহর'', পৃ ২) এবং আগামী দিনের কবি ও শিল্পীকে 'শোণিত স্বাক্ষরে' 'হৃদয়ের প্রেক্ষাপটে' সেই কথা আঁকতে আহ্বান জানাচ্ছেন ("সেই রাতি", ঐ পৃ ৫)। ১৯৪৭ সালে প্রবল আশাবাদে উজ্জীবিত কবি লিখেছেন :

বিত্তহীনের যে অস্থি আজ
হয়েছে দাবার ঘুঁটি,
নামবে সে কাল সংহার হয়ে
বজ্র বাঁধন টুটি। (আগামী দিনের স্বপ্ন, ঐ, পৃ ৫৭)।

৬

ফররুখ আহমদ প্রথম পর্যায়ে (১৯৩৫–১৯৪১) আকৃষ্ট হয়েছিলেন সমকালীন বামপন্থী রাজনীতির প্রতি। *কবিতা, পরিচয়, অরণি, নবযুগ, নবশক্তি* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সাম্যবাদী অনুভবজাত এ কালের কবিতা। অগ্রন্থিত এ সব কবিতার কয়েকটি সংকলিত হয়েছে কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কবির অভিলষিত নাম; *হে বন্য স্বপ্নেরা* (১৯৭৬) গ্রন্থে। ভূমিকায় সম্পাদক জিল্লুর

রহমান সিদ্দিকী লিখেছেন :

> এসব কবিতার নিবিড় নিপুণ ধ্বনি ও ছন্দের আনন্দ মনে করিয়ে দেয় আরেকজন বামপন্থী কবির কথা– যিনি ফররুখেরই সমবয়সী— সুভাষমুখোপাধ্যায়।[১৪]

এরপর কবির চেতনালোকে পরিবর্তন ঘটে। সমকালীন রাজনীতির অঙ্গনে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার দাবি ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কলকাতায় ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি; কবি এর সঙ্গে যুক্ত হন। পশ্চাৎপদ নির্যাতিত বাঙালি তথা ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীন স্বদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নরূপে 'পাকিস্তান' তাঁকে আকর্ষণ করে। ১৯৪৩–৪৪ সালে রচিত এবং প্রধানত *সওগাত* ও *মোহাম্মদীতে* প্রকাশিত এই চেতনাজাত ১৯টি কবিতা নিয়ে ১৯৪৪ সালে কলকাতায় প্রকাশিত হয় ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাত–সাগারেরমাঝি* , আধুনিক বাংলা কাব্যে এক অতি বিশিষ্ট সংযোজন। গ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেন : "বিশ শতরে শ্রেষ্ঠ তামদ্দুনিক রূপকার,/ দার্শনিক মহাকবি, আল্লামা ইকবালের/ অমর স্মৃতির উদ্দেশে–"। এই উৎসর্গপত্রে ইকবালের উদ্দেশে রচিত সনেটিতে কবি ফররুখ আহমদ বস্তুতপক্ষে তাঁর *সাত সাগরের মাঝি*'র কাব্য ভাবনার সারাৎসার লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে নিম্নোদ্ধৃত চরণসমূহ স্মরণযোগ্য :

> নতুন পথের মোহে তৃপ্তিহীন তোমার অন্বেষা–
> পাড়ি দেয় মরু, মাঠ, বন,
> অথই দরিয়া তীর। হে বিজয়ী! তবু অনুক্ষণ
> ধ্যান করো কোন পথ, কোন রাত্রি অজানা তোমার,
> এক সমুদ্রের শেষে জাগে অন্য সমুদ্র স্বনন!
> যেথা ক্ষীয়মাণ মৃত পাহাড়ের ঘুমন্ত শিখরে
> জীবনের ক্ষীণসত্তা মূর্ছাতুর, অসাড়, নিশ্চল;–
> সে নির্জিত তমিস্রা সাগরে
> দিনের দুর্জয় ঝড় আনিয়াছ, হে স্বর্ণ ঈগল।।

"সিন্দাবাদ," "দরিয়ায় শেষ রাত্রি", "আকাশ নাবিক", "পাঞ্জেরী", "স্বর্ণ ঈগল" "আউলাদ" এবং সবশেষে " সাত-সাগরের মাঝি" কবিতায় এই বক্তব্যই কবি প্রতীকে, উপমায় ও প্রত্যক্ষ উচ্চারণে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। লক্ষণীয়, দুরূহ আরবি-ফারসি শব্দমালার ব্যবহার প্রথম দুটি কবিতায় প্রচুর কিন্তু পরবর্তী কবিতায় ক্রমে তা কমে এসেছে। এ গ্রন্থে আরো দুটি স্মরণীয় কবিতা আছে "ডাহুক" ও "লাশ"। ডাহুকের ডাকের প্রতীকে জিকিরের তন্ময়তা ফুটিয়ে

তুলেছেন কবি। এই কবিতার চিত্রকল্পসমূহে ও বর্ণনায় এবং ছন্দ-নিয়ন্ত্রণে তিনি অসাধরণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যদিকে "লাশ" 'তেরশ পঞ্চাশে'র মন্বন্তরের পটভূমিতে একটি অসাধারণ কবিতা। মানুষের সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে ঐ কালে অনেকেই কবিতা, কথাসাহিত্য ও নাটক লিখেছেন। সে সবের মধ্যে যে স্বল্প সংখ্যক সৃষ্টি চিরায়ত মর্যাদা লাভ করেছে "লাশ" কবিতা নিঃসন্দেহে তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট রচনা। প্রথম কাব্যগ্রন্থেই ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতার উৎকর্ষ, বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফররুখ আহমদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ একটি ২০ পৃষ্ঠার পুস্তিকা : *'আজাদকরপাকিস্তান'।* ৫টি গান ও ৫টি কবিতার এই সংকলন সম্ভবত ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়; রচনাকাল ১৯৪৩-৪৬।

তালিম হোসেনও ইসলামী চেতনার কবি এবং 'পাকিস্তান' তাঁর স্বপ্নকল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। এ বিষয়ে চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে রচিত তাঁর কবিতারসংকলন *দিশারী* অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৬ সালে।

আবুল হোসেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নববসন্ত* প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। এ গ্রন্থের কবিতায় তিরিশের কাব্যদ্যোতনার সঙ্গে একটা আশাবাদী মনের স্পন্দন অনুভব করা যায়। চল্লিশের দশকে পত্রপত্রিকায় তাঁর যে সব কবিতা প্রকাশিত হয় তাতে লক্ষ করা যায় তিরিশের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুসরণ। কবিভাষায় তিনি অমিয় চক্রবর্তীর অনুরূপ নিরীক্ষায় বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *বিরসসংলাপ* প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে আর তৃতীয় কাব্য *হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস* প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে।

৭

সৈয়দ আলী আহসান পাকিস্তান প্রস্তাব ও ইকবালের চিন্তাধারা দ্বারা ফররুখ আহমদের মতই অনুপ্রাণিত হন তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনে (১৯৪০-৪৪)। ১৯৪২ সালে কলকাতায় *আজাদ* ও *মোহাম্মদী* কেন্দ্রিক পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে সৈয়দ আলী আহসানের প্রচেষ্টায় ঢাকায় ফজলুল হক হলে আয়োজিত এক সভায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'; তিনি এই সংসদের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। সংসদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জীবন ঐতিহ্য ও সমাজ পরিবেশ কেন্দ্রিক নতুন সাহিত্য সৃষ্টি। এই সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে তিনি 'আইরিশ রিভাইভালিজমের'র অনুরূপ আলাউল প্রমুখ পূর্বসুরি বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের রচনা ও বিশেস করে পুঁথিসাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা আহরণে সচেষ্ট হন এবং ভাবপ্রকাশের জন্য নজরুলের মতো

আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে আগ্রহী হন। সৈয়দ আলী আহসানের পারিবারিক পরিবেশও তাঁকে ঐ পর্যায়ে ইসলামী কবিতা রচনায় আগ্রহী করে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে কলকাতার *মোহাম্মদী* পত্রিকায় তাঁর ঐ সব কবিতার অধিকাংশ প্রকাশিত হয়। বিষয় ইসলামী হলেও একালের কবিতায় ইয়েটস ও এলিয়টের প্রভাব খুবই প্রত্যক্ষ। এলিয়েটের সৃষ্টির অনুষঙ্গের বদলে সৈয়দ আলী আহসান ইসলামী অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন আর ইয়েটসের আইরিশ লোকজ উপাদানের বদলে তিনি ব্যবহার করেছেন পুঁথিসাহিত্যের উপাদান। লক্ষণীয় যে, এ সব কবিতায় ফররুখ আহমদের মত আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে অত্যুৎসাহ নেই। তিনি বরং ক্রমে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শব্দ প্রয়োগ রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। *জোহরা ও মুশ্‌তরী* বা *চাহার দরবেশের পুঁথি* থেকে আহরিত কাহিনী তিনি উপস্থাপন করেছেন ইয়েটস অনুসৃত জাপানি নাটকের ভঙ্গিতে। আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, তিনি প্রথমাবধি চল্লিশের দশকের কবিতার এক প্রধান ধারা মার্কসীয় চিন্তাচেতনার বিরোধী ছিলেন। সৈয়দ আলী আহসান পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে ইসলামী বিষয় নিয়ে কবিতা লিখলেও কবি হিসেবে তিনি ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং এদিক দিয়ে তাঁর মুখ্য অনুপ্রেরণা ইয়েটস-এলিয়ট এবং অংশত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাই চল্লিশের দশকে রচিত তাঁর এই সব কবিতা নিয়ে তিনি কোন গ্রন্থ প্রকাশ করেননি বরং পরবর্তীকালে একালের কবিতা তিনি *কাব্যসমগ্রে* (১৯৭৪) বর্জন করেছেন এই বলে যে, "আমার বিচারে সেগুলো আমার কাব্য রচনার উন্মেষের সংবাদ বহন করে কিন্তু কোন প্রকার সিদ্ধির পরিচয় বহন করে না।"[১৫] তাঁর এই অভিমতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ এসব কবিতা ১৯৮৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন এবং ১৪ পৃষ্ঠাদীর্ঘ ভূমিকায় এই কবিতাসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন।[১৬]

৮

১৯৪৭ সালে ১৪/ ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশ শাসনের অবসানে পাকিস্তান ও ভারত প্রতিষ্ঠিত হলে উভয় দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি শ্লোগান তোলেন : ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়/ লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'। পার্টির সিদ্ধান্ত ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিতাড়ন সম্ভব হলেও সাধারণ মানুষের মুক্তির সংগ্রাম শুরু করতে হবে এর পর থেকে। ফলে প্রায় তাৎক্ষণাৎ পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়।

অন্যদিকে, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ বাংলার জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান। আর ঐ বছর ১৪ই আগস্ট প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল তৎকালে পূর্ববাংলা নামে অভিহিত এলাকার জনগোষ্ঠী ছিল পাকিস্তানের সমগ্র জনগোষ্ঠীর ৫৪%। কিন্তু পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেন ভারত থেকে আগত উচ্চবিত্ত 'মোহাজের' নেতৃবৃন্দ। তাঁরা স্থানীয় জনসাধারণের সকল ভাষা উপেক্ষা করে ভারতের ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন। উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, কবি ফররুখ আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ এবং আরো অনেকে পাকিস্তানের বিশেষত 'পূর্ব পাকিস্তানের' রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। সঙ্গত কারণেই উর্দুর ঘোষণামাত্রই পূর্ববাংলায় প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হয়। ১৯৪৮-এর প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মদানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম সূচিত হয়। ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবল প্রাণশক্তির সঞ্চার করে।

উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলামী জাগরণের কবি হিসেবে চিহ্নিত করে অসুস্থ ও সম্বিতহারা কবি কাজী নজরুল ইসলামকে 'পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি' অভিধা প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে[১৭] কবি গোলাম মোস্তফা ও তাঁর সহযোগী-বৃন্দ এর প্রবল প্রতিবাদ করেন[১৮] এবং পাল্টা নজরুলের কবিতার 'শুদ্ধিকরণ' ও 'পাকিস্তান সংস্করণে'র প্রস্তাব করেন। পাকিস্তান বিষয়ক উচ্ছ্বসিত কবিতা ও গান রচনায় গোলাম মোস্তফা সবসময় ব্যাপৃত ছিলেন।

এ সময় ফররুখ আহমদ ইসলাম ও মুসলিম প্রসঙ্গযুক্ত কাব্যগ্রন্থ *সিরাজুম মুনীরা* (১৯৫২), কাহিনীকাব্য *হাতেম তায়ী* (১৯৬৬) এবং কাব্যনাট্য *নৌফেল ও হাতেম* (১৯৬৭) প্রকাশ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী শাসকবর্গের হাতে দেশের 'মজলুম' জনসাধারণের ভাগ্যের পরিবর্তনের কোন 'প্রকৃত ইসলামী' পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় ছদ্মনামে (হায়াত দরাজ খান পাকিস্তানী) তীব্র ব্যঙ্গ কবিতা রচনা শুরু করেন। তালিম হোসেনও *শাহীন* (১৯৬২), *নূহের জাহাজ* (১৯৮৩), *ইসলামী কবিতা* (১৯৮১) প্রকাশের পাশাপাশি ফররুখ আহমদের মতো ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতে থাকেন এবং দীর্ঘসময় কবিতা রচনা ত্যাগ করেন। পাকিস্তানে তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় তাঁরা ব্যঙ্গমুখর হয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানী শাসনের অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ মুখর হননি এবং

মূল কাব্যচিন্তাও পরিবর্তন করেননি।

একালে আহসান হাবীব ও সিকান্দার আবু জাফরের রোমান্টিক সাম্যবাদী জীবনবোধ তাঁদের সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন; ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে তাঁরাও ব্যঙ্গমুখর হয়েছেন। আর সৈয়দ আলী আহসান খুঁজে পেয়েছেন নতুন বক্তব্য ও কবিভাষা। সিকান্দার আবু জাফর ও সৈয়দ আলী আহসানের ষাটের ও সত্তরের দশকের কবিতা, বিশেষত উভয়ের মুক্তিযুদ্ধে অবদান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ের শেষাংশে সানাউল হক (জন্ম ১৯২৪), আবদুর রশীদ খান (জন্ম ১৯২৭), আশরাফ সিদ্দিকী (জন্ম ১৯২৭), আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (জন্ম ১৯১১), হাবীবুর রহমান (জন্ম ১৯২৬), মাযহারুল ইসলাম (জন্ম ১৯২৮) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তথ্যনির্দেশ

১ দ্রষ্টব্য : রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, *বাঙলাদেশ* (মনসুর মুসা সম্পাদিত), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪, পৃ ৩৫৭

২ দ্রষ্টব্য. ঐ, পৃ ৩৬৪–৩৬৫

৩ ঐ, পৃ ৩৬৫–৬৬

৪ ঐ, পৃ ৩৬৬

৫ ঐ, পৃ ৩৬৭

৬ ঐ, পৃ ৩৬৮

৭ ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত; *মার্কসবাদী সাহিত্য বির্তক*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৯৭৫, পৃ ছাব্বিশ দ্রষ্টব্য

৮ ঐ, পৃ আঠাশ

৯ ঐ, পৃ বত্রিশ দ্রষ্টব্য।

১০ ঐ, পৃ চোদ্দ–সতেরো দ্রষ্টব্য।

১১ ঐ, পৃ আঠারো–উনিশ।

১২ ঐ, পৃ উনচল্লিশ।

১৩ মনীন্দ্র রায়, *আমার কালের কবি ও কবিতা*, কলকাতা : কথামালা, ১৯৮১, পৃ ৫৭

১৪ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, "ভূমিকা", *'হে বন্য স্বপ্নেরা' : ফররুখ আহমদ*, ঢাকা; ফররুখ আহমদ কেন্দ্রীয় স্মৃতি সংসদ, নভেম্বর ১৯৭৬

১৫ সৈয়দ আলী আহসান, ভূমিকা, *কাব্যসমগ্র*, ঢাকা: লালন প্রকাশনী পৃ ১৭

১৬ সৈয়দ আলী আশরাফ, সংকলন ও ভূমিকা, *চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা : সৈয়দ আলী আহসান* , ঢাকা, মোকাররম পাবলিশার্স, জুলাই ১৯৮৫

১৭ মুজিবর রহমান খাঁ, *মোহাম্মদী ১৯৫০;* আবদুল মওদুদ , *মাহে-নও ১৯৫০*, আজাদ সম্পাদকীয় ১৯৫০

১৮ *নওবাহার*, ১৯৫০